International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-VI, May 2015, Page No. 1-5
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের আদিবাসী ও অবাঙলা ভাষাভাষীদের কথ্যরীতিতে ঔপভাষিক মিশ্রণ প্রক্রিয়া

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

Dialectical influence in mother tongue. Dialectical mixture of refugees of West Bengal. Common link of Dialectical mixture in dialect. Local Dialectical mixture on the Refugees. The Dialectical mixture in the spoken language of non-Bengali speaking people. The Group-Analysis of Tribal's and non-Bengali-speaking people. The dialectical mixture link in their spoken language of the inhabitant of DOAB area of the Ganga and the Padma. The dialectical area in Bihar, Jharkhand and Odisha. The Characteristic of word root, verb root, number and Gender. Their linguistic and colloquial specialities. Finally, Findings of dialectical blending in there linguistic groups.

Key Words: The area in between the Ganga and the Padma (DOAB Area); The East Bengal refugee in West Bengal in the Eastern side of the Bhagirathi; Dialectical mixture; Dialectical Zone; Bengal Presidency; Concentric Administration; The Centroid Administration; Partition of Bengal in 1905; word root and verb root; New Modern into Aryan Language.

মানুষের উপর তার মাতৃভাষার তথা ব্যবহৃত উপভাষার প্রভাব অসীম এবং স্থায়ী। জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক আচরণের মতই মানুষের মনের অন্তরালে এই প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। পরিবর্তন যেটুকু হয় সে বিবর্তনের ফল। এমন কি পরিবেশের পরিবর্তন হলেও তার বাচনরীতি ঔপভাষিক উল্লম্ফণকে অতিক্রম করেও মনের সঙ্গোপনে সুপ্ত থাকে। পরিবর্তিত ভাষিক প্রবণতার মধ্যে জীবের বিবর্তনের মতই চিহ্ন রেখে যায়। কখনো তা সুপ্ত, কখনো অপ্রয়োজনীয় দেহাংশের মত। শুধুমাত্র নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই এর সন্ধান মেলা সম্ভব। এই প্রভাব, অর্থাৎ মাতৃ উপভাষার প্রভাব, শুধু বাচনভঙ্গিই নয় উপভাষার সতর্ক শিষ্ট প্রয়োগের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

বিগত শতাব্দের আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই প্রবন্ধকার পূর্বাবঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের ঔপভাষিক মিশ্রণ প্রসঙ্গে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে লক্ষ্য করেন, যে ভাষিক মিশ্রণ শুধু উপভাষার মধ্যেই নয়, ভিন্ন ভাষার মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকে। তা নিজের ভাব প্রকাশেও প্রতিফলিত হয়। মানুষ বেঁচে থাকার দায়েই ঠিকানা বদল করতে হয়। কখনো রাষ্ট্র বিপ্লব কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আবার কখনো শুধুই নিজের এবং পরিবারের উদর পূরণের জন্য। এভাবে নানা সময়ই তাকে আত্মীয় পরিজন স্বাভাবিক পরিচিত পরিবেশের বাইরে একদম ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। তখন নতুন পরিবেশ নতুন প্রথা, সংস্কারে তাকে মানিয়ে চলতে হয়। এভাবেই গোষ্ঠীগত অবস্থানে তার নিজস্ব ভাষা প্রভাবিত হয় আবার ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে তাদের মত করে তাদের ভাষায় ভাব বিনিময় করতে গিয়ে তার মাতৃভাষার উচ্চারণরীতি স্থানীয় ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে দুরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ তার নিজের ভাষা, দ্বিতীয়তঃ প্রবাসী ভাষা। এক সময়ে পূর্ববাঙলার উদ্বাস্তুদের উপর স্থানীয় ঔপভাষিক প্রভাব আবার ভিন্ন ভিন্ন ঔপভাষিক অঞ্চলের মানুষদের সামাজিক ব্যাপক মিশ্রণে ঔপভাষিক মিশ্রণ লক্ষ্য করেছি। তখনই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিবিড় চলাচলের সময় নজর আসে আদিবাসী ও অবাঙলাভাষী সমাজের মানুষদের। তাদের কিছু এলাকায় মিশ্রবসতি আবার কিছু এলাকায় অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত বসতি তাদের কথ্যরীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার স্থানীয় মানুষের সাথে ভাব বিনিময় করতে গিয়ে তাদের কথ্যরীতির প্রভাবও লক্ষণীয় হয়েছে। এভাবেই কৌতূহলী হয়েই লক্ষ্য করতে গিয়ে যে অঞ্চল নিয়ে কাজ করেছি সেই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত অবাঙলাভাষাভাষীদের ঔপভাষিক মিশ্রণ নিয়ে একটা সীমাবদ্ধ এলাকায় কিছু পর্যবেক্ষণ করা গেছে। ফলে তাই আমার গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভাগীরথীর পূর্বতীরের গঙ্গা পদ্মার দোয়াবের একটি অংশ। সহজ পরিচিতির ভৌগোলিক বিবরণ অনুসারে তা হ'ল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বর্তমানে উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উত্তর পূর্বাংশের কলোনিগুলিতে নিবিড় পরিক্রমাকালে অবাঙলাভাষাভাষীদের নিয়েও নিতান্ত কৌতূহলেই কিছু চর্চা হয়ে গেছে। সেই চর্চা থেকে সত্যিই এক অন্য রকম মিশ্রণের সূত্র – সন্ধান করা যেতে পারে। উপরে উল্লেখ করা অঞ্চলে অবাঙলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে ট্রেডিশনাল আদিবাসী সমাজের যেমন সাক্ষাৎ মেলে, বর্তমানে বিহার রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষেরা যারা কর্মোপলক্ষে এই উল্লিখিত অঞ্চলে বসবাস করেছেন তারাও রয়েছেন। আর রয়েছেন ওড়িয়াভাষাভাষী সম্প্রদায়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁড়াও, খড়িয়া

এবং মালপাহাড়ী জনগোষ্ঠী। অবাঙলাভাষাভাষীদের মধ্যে রয়েছে ভোজপুরী, মৈথিলী ও ওড়িয়া ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

বাঙলাভাষাভাষী উদ্বাস্তুদের উপভাষা নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণ নির্ণয়ের সময় খুব সঙ্গত কারণেই তাদের বাচনিক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে একাধিক বিভাগ – উপবিভাগ ভাগ করে নিতে হয়েছিল। এই বিভাগগুলির মধ্যে যেমন ছিল বয়স বা প্রজন্মগত বিভাজন তেমনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অচল ও সচলের শ্রেণিকরণ। অবাঙলাভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে এই বিভাজনের হিসেবে কোন নিবিড় চর্চার সুযোগ নেই। যেটা আছে সেটা হলো আদিবাসী এবং বিহারী অর্থাৎ বিহার প্রদেশবাসী। আদিবাসী সমাজের মুখ্য জনগোষ্ঠী হলো সাঁওতাল, তারপর মুন্ডা, ওঁড়াও, মালপাহাড়ী এবং খড়িয়া; ভাষা বিভাগে বিহার থেকে আসা মানুষদের মধ্যে, ভোজপুরী উপভাষিক ও মৈথিলী উপভাষিক মানুষেরা পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের মত এদের মধ্যে নিবিড় ঔপভাষিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে একটাই ধরে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত অবাঙলা ভাষাভাষী মানুষকেই সচল বলে একটি মাত্র শ্রেণিতেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। আবার এদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত উপবিভাজনও করা হয়নি। কারণ যারা কর্মোপলক্ষে এসে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করছেন, আদিবাসী নয়; হিন্দী ভাষাভাষীদের গরিষ্ঠ মানুষই একক বাস করে থাকেন। তারপর যে অতিনগণ্য সংখ্যক আগত পরিবার নিয়ে থাকেন তাদের পরিবারের সাথে বাচনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ এই পরিবারের সদস্যরা প্রায় সকলেই; অচলই শুধু নন, তারা নিতান্তই সংকীর্ণ সচল। এরই মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের যারা বর্তমান; তাদের পরিবারের সদস্যরাও কর্মসূত্রে বাঙলা ভাষাভাষী মানুষদের সাথে মেলা মেশা করেন। সুতরাং তারাও সচল।

প্রাথমিকভাবে এই সব ভাষাগুলির গোষ্ঠী বিচার করে দেখা যায় যে, আদিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে ওঁড়াও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অপরদিকে সাঁওতালী এবং মুন্ডারী ভাষা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অস্ট্রো-এশিয়াটিক সম্ভূত অষ্ট্রিকের নিষাদপরিবারভুক্ত। যুয়াঙ ও মনখোরাও এই একই পরিবারভুক্ত। অন্যদিকে ভোজপুরী, মৈথিলী ও ওড়িয়া এই তিনটি ভাষাই নব্যভারতীয় আর্যভাষা। ড. সুকুমার সেন নব্যভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্যা শাখার মগধীয় শাখাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পূর্বমগধীয় এবং পশ্চিমমগধীয়। পূর্ব মগধীয় থেকে ওড়িয়া, বাংলা অসমীয়া উৎপন্ন। আচার্য সুকুমার সেন পূর্বমগধীয় ভাষাকে বস্তুত দুই ভাগে ভাগ করেছেন, ওড়িয়া এবং বঙ্গঅসমীয়া। বঙ্গঅসমীয়া থেকে বাঙলা এবং অসমীয়ার ভাষার বিকাশ। অন্যদিকে পশ্চিমমগধীয় থেকে বিকশিত ভাষা হিসেবে ভোজপুরী, মগহী এবং মৈথিলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অপরদিকে হিন্দীভাষা পণ্ডিতদের মতে ভোজপুরী পুরোপুরি মগধী সম্ভূত নয়। ভোজপুরী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পূর্বীশৌরসেনী মিশ্রিত পশ্চিমমগধী থেকে জাত মল্লিকা বা কারুপিকা অপভ্রংশ থেকেই ভোজপুরী ভাষার সৃষ্টি। এই সব ভাষাভাষী মানুষদের ঔপভাষিক মিশ্রণ এবং প্রভাব সম্পর্কে বুঝতে এই ভাষাগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানা জরুরী।

গবেষণার এলাকাটি পূর্বগাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বতীরের গঙ্গা পদ্মার দোয়ার অঞ্চলের একটি অংশ। সহজ পরিচিতির ভৌগলিক বিবরণ অনুসারে তা হলো মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চল এবং অবশ্যিই পদ্মা গঙ্গার সংকীর্ণ দোয়ার এড়িয়ে। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদে রেল ষ্টেশন থেকে মোহনা প্রবাহে ভাগীরথীর তীরবর্তী অবশিষ্ট অঞ্চল, নদীয়া জেলার বৃহদংশ এবং উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতি ক্ষুদ্র খন্ডাংশ। এই নির্বাচিত অঞ্চল আদিবাসী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ০.০১ শতাংশের কাছাকাছি এবং অন্য ভাষাভাষী জনসংখ্যাও তদ্রুপ। আমাদের নির্বাচিত অঞ্চলে আদিবাসীদের আগমনের কারণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার আদিবাসীদের কিছু পুরানো বসতি আছে। এরা স্বাধীনতা-পূর্ব সময়কাল থেকেই রয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বর্ধমান-পুরুলিয়ার মত নিবিড় সংহত সামাজিক বসতি এখানে নয়। এই এলাকার আদিবাসীরা নিজেদের অজান্তেই সাধারণ সমাজের প্রতিবেশি হয়ে উঠেছেন। কারণ উত্তর-স্বাধীনতা আগত উদ্বাস্তুভারে জনবিস্ফোরণের ফলে বসতি এলাকা আদিবাসী মানুষকে এই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনেকাংশেই সম্পৃক্ত করে নিয়েছে।

এর ফলে এদের ভাষিক প্রবণতায় দুধরণের পরিবর্তন এসেছে, একদিকে এদের নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে স্থানীয় কথ্যরীতির প্রভাব পড়েছে, দুই, এদের দ্বিভাষিক প্রবণতা নিবিড় হয়ে স্থানীয় কথ্যরীতিতে ভিন্নতা পেয়েছে। সর্বোপরি তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য আগ্রহ জাগায় সে হলো আদিবাসীদের ভাষায় পরস্পরের প্রভাব পড়েছে শব্দ ব্যবহার বাচিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকরণ অনুসারে লক্ষ্য করলেই এই পরিবর্তন অনুধারণ করা যাবে। আদিবাসীদের মধ্যে এইসব গবেষণা অঞ্চলে গরিষ্ঠরা হলেন সাঁওতাল তারপর ক্রমানুসারে মুন্ডা, ওঁড়াও এবং খড়িয়া। এছাড়াও বিচ্ছিন্ন ভাবে অল্প সংখ্যক মালপাহাড়িয়াও আছেন। তাদের নিয়ে অল্প সংখ্যক শব্দচয়ন কথ্যরীতি ও বাচিক প্রবণতা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সংখ্যায় এত অপ্রতুল যে মালপাহাড়িয়াদের নিয়ে কাজ পরিত্যাগ না করলেও আপাতত সংযত থাকার পরিকল্পনা করেছি।

শুধু আদিবাসীরাই নয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে এমনকি তার পূর্বেও সমগ্র বঙ্গদেশেই সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে অনেকেই এসেছেন। প্রাক্-ঊনবিংশ শতাব্দে যাদের আনা হয়েছিল তারা মূলতঃ বাহিনীর কাজেই কিংবা ধর্মাচরণের সূত্রে যাতায়াত করতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বিস্তার এবং শিল্প স্থাপনার পর কলকাতা রাজধানী হবার সুবাদে কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে প্রতিবেশি রাজ্যগুলি থেকে সর্বস্তরের মানুষের আগমন ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা বেঙল প্রেসিডেন্সী হিসেবে এককেন্দ্র শাসনাধীন ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময়ে এই রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র্য রাজ্যরূপে নিজেদের অস্তিত্ব অর্জন করে। সেই সাথে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রেলপথ ব্যাপক যোগাযোগ গড়ে তোলে। ফলে শিল্প এবং বিভিন্ন পরিষেবায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে বিহার, উড়িষ্যা থেকে বহু মানুষ এরাজ্যে চলে আসেন। কলকাতা সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে তারা নিবিড় ভাবে বসতি শুরু করে কারখানার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় বাসস্থান পেয়েছে আর এর বাইরে রেলপথের ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাত্রীদের মালপত্র ইত্যাদি বহনের জন্য যে সহায়ক প্রয়োজন হয়, রেল কোম্পানীর

উদ্যোগে সেইসব পরিষেবা প্রদানকর্মী হিসেবে রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন, এরা এই সূত্রে শুধু রেল নয় ব্যক্তিগত মালিকের বিভিন্ন রকম প্রয়োজন শ্রমিক হিসেবেও বসবাস শুরু করেন।

এরা স্থায়ীভাবে দীর্ঘকাল থাকলেও প্রবাসীই থেকে যায়। কর্মসূত্রে এ রাজ্যে থাকলেও সমাজ এবং সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করেননি কখনো। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মৌলিক আচরণ বজায় রেখেছেন। ফলে এদের বাচনিক এবং ভাষিক প্রবণতায় মৌলিকত্ব রাখার চেষ্টা করেছেন। তারই মধ্যে এদের স্থানীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে চলতে গিয়ে ভাব প্রকাশ এবং কথ্যরীতিতে বাচনভঙ্গিতে মিশ্রণ ঘটেছে। পশ্চিমবাংলায় সংলগ্ন রাজ্যগুলির মধ্যে কর্মসূত্রে সবচেয়ে বেশি এসেছে অবিভক্ত বিহার থেকে। তারপর উড়িষ্যা থেকে। বিহার রাজ্যের মধ্যে তিনটি ভাষিক অঞ্চল রয়েছে যা শুধু বাচিক নয় ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে এখনো স্বাতন্ত্র্য রাখার চেষ্টা করছে। বরঞ্চ বর্তমান সময়ে সেই চেষ্টা সম্পর্কে আগ্রহ আরও বেড়েছে।

বিহারের এই ভাষিক অঞ্চলগুলি হলো মগহী বা মগধী, ভোজপুরী এবং মৈথিলী। ফলে এই প্রবন্ধকারের পর্যবেক্ষণ এই কয়েকটি উপভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রবন্ধকার তার কাজের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন সেটি সাধারণের কাছে নিরস প্রতিভাত হতে পারে বিবেচনা করে সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাকরণের সূত্র এবং চিহ্নগুলি উল্লেখ এবং যথাযথ দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে সাধারণ পাঠক আগ্রহান্বিত হন। প্রবন্ধকার সাঁওতালী, মুন্ডারী, ওঁড়াও, খড়িয়া এবং মালপাহাড়ি এই পাঁচটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এবং ওড়িয়া, ভোজপুরী ও মৈথিলী তিনটি আধুনিক আর্যভাষার প্রবাসীদের নিয়ে কিছুকাজ করার চেষ্টা করেছেন। আদিবাসী এবং আধুনিক আর্যভাষা জাত ভাষাভাষীদের মধ্যে স্বতঃ কোন যোগ নেই। এদের যোগসূত্র একটাই এরা এদের স্বাভাবিক বসতি এলাকার বাইরে অন্য এক ভাষাভাষী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে যেভাবে বাচনিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয় কিংবা নিজেদের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত করে সেই সূত্রটি। যেটি বাঙলা ভাষা। মূলতঃ পর্যবেক্ষণ এলাকা এটাই। এই প্রবন্ধে আদিবাসী ভাষাসমূহ এবং উল্লেখিত আঞ্চলিক আর্যভাষাগুলি কিভাবে পরস্পর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত সেই বিচার করা হয়নি। বিচারের লক্ষ্য হলো এসব মানুষেরা কিভাবে বিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বাঙলাভাষাভাষীদের সাথে বসবাস করে বাঙলাভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কথনে এবং সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়েছেন। অতি বিশেষভাবে কথনে। প্রবন্ধকার সাংস্কৃতিক পর্যবেক্ষণ করলেও সে সম্পর্কে আদৌ কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে সময়ভাবে ভুগেছেন। তার নিজের পাঠক্ষেত্র ভাষা-বিজ্ঞান তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং কোন বিস্তারিত বিবরণ এখানে আশা করা অমূলক। আর ব্যস্ত পাঠক সমাজকেও সংকীর্ণ অংশের আগ্রহের দ্বারা অহেতুক প্রভাবিত করার ইচ্ছাও নেই। তবে পাঠকের যদি কৌতূহল সামান্যও জাগে তাতেই লেখক নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

নির্বাচিত অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের শতকরা হার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রবন্ধের পূর্বাংশে উল্লেখ করেছি। এখন আদিবাসী সমাজের এবং আর্যভাষাভাষীদের প্রত্যেকটির ভাষিক প্রবণতা মিশ্রণ সম্পর্কে অতি সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবো।

সংস্কৃত ভাষার শব্দরূপে বচন তিনটি। একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সংস্কৃত পাঠে ব্যবহার এবং লেখায় এই তিনটি চর্চা আবশ্যিক। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে সাধারণভাবে যে ভাষাগুলি সংস্কৃত জাত তার কোনটিতেই এই তিনটি বচনের অস্তিত্ব নেই। কথ্য এবং লিখিতরূপ কোথাওই নেই। যে সময় থেকে এই ভাষাগুলির পরিচয় লাভের অঙ্কুর উদ্‌গমন শুরু হয়েছে সেই সময় অর্থাৎ এ সব নব্য ভাষাগুলি প্রত্নকাল থেকেই তিনটি বচনের বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছে। এদের শুধুই একবচন এবং বহুবচন। এই সত্য পূর্বভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাধারণ মিল অবশ্যই বর্তমান। তা হলো এই বচন সংখ্যা। কিন্তু মজার বিষয় হলো, আদিবাসীভাষা সমূহে সাঁওতালীসহ মুণ্ডারী এবং খড়িয়া ভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন তিনটি বচনই বর্তমান। কিন্তু ওঁড়াওদের মধ্যে আবার একবচন এবং বহু বচন এই দুটি মাত্র বচন। অন্যদিকে নব্যভারতীয় আর্যভাষা ওড়িয়া, ভোজপুরী এবং মৈথিলী এই তিনটি মগধী অপভ্রংশ জাত। এরা মগধী, অর্ধমগধী বা অবহট্ট জাত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ অসমীয়ার মত ওড়িয়াকেও বাঙলাভাষারই সহোদরা বলে থাকেন। অন্যদিকে মৈথিলী ভাষাভাষী অঞ্চল এখন বিহার রাজ্যের অন্তর্গত হলেই মৈথিলী ভাষা বাঙলাভাষার আদিকালের ভাষা। সর্বশ্রেষ্ঠ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি বাঙলাভাষার বিশেষ করে পদাবলী সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্যদিকে হিন্দীভাষাতেও বিদ্যাপতি আদিকবির মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

মৈথিলী ভাষার এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখের কারণ একটাই মৈথিলীভাষাভাষী জনসংখ্যা ২০০১ জনগণনানুসারে মোটামুটি ভাবে এক কোটি। বর্তমান এই সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ তিরিশ লক্ষের মত। মৈথিলীভাষাকে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক উত্তর-পশ্চিম গৌড়ীভাষা জাত বলে চিহ্নিত করতে চান। আর ভোজপুরী ভাষাকে বর্তমানে হিন্দীভাষার পূর্বী শাখা বলে মনে করতে চান। এর কারণ হিসেবে তারা দুটি বিচিত্র সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সে হ'ল ধর্মীয় ও আচরণগত এবং খাদ্যাভাস সম্পর্কিত। তাদের বিশ্লেষণ ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাচর্চার এবং সামাজিক নিদানকেন্দ্র হিসেবে কাশী এবং নবদ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবস্থান করে। এই দুই চর্চা কেন্দ্রের পঞ্চাঙ্গ গণনা পদ্ধতি ভিন্ন। ফলে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখনীয়, এদের দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলির বিবাহের লগ্ন গণনাকাল ভিন্নভিন্ন আবার বাঙলা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলের মাছ খাওয়া এবং শক্তি সাধনা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এরই প্রাণকেন্দ্র রয়েছে বৈষ্ণব সাধনা। গৌড়ীয় প্রভাবে বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণতই মিথিলা অঞ্চলের অভ্যাসগুলি পর্যবেক্ষণ করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে। অন্যদিকে মগহী এবং ভোজপুরী অঞ্চলে শ্রীরাম-ভজনাই বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব। বাঙলা, ওড়িষ্যা এবং মিথিলা অঞ্চলে মৎস-মাংসাদি আহার এবং শক্তি পূজার প্রাবল্য ভোজপুরী অঞ্চলে প্রায় এর বিপরীত এরা শাকাহারে প্রভাবিত। ভোজপুরী ভাষাভাষী জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি। ২০০১ জনগণনায় এই সংখ্যাকে দুই কোটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাষিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এবং গোষ্ঠীবিচারে আদিবাসীদের ভাষাগুলি সাঁওতালী এবং মুন্ডারী অষ্ট্রিকভাষাবংশ জাত দুটি শাখার অষ্ট্রকোল উপশাখা জাত। অন্যদিকে ওঁড়াও এবং খড়িয়া দ্রাবিড় গোষ্ঠী জাত। দ্রাবিড় গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা। সাঁওতালী ও মুন্ডারী আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে নিজেদের শ্রেণিচরিত্র এত দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পরও ধরে রেখেছে। সে বৈশিষ্ট্য হলো বাচনিক বৈশিষ্ট্য। এই ভাষা দুটিতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সংস্কৃতের মত এই তিনটিরই অস্তিত্ব বর্তমান। আবার শুধু তাই নয়, ব্যক্তি বাচক সর্বনামে উত্তম পুরুষে দ্বিবচন ও বহুবচনের দুটি রূপ সাঁওতালীতে বর্তমান। একটি সাধারণ শ্রোতা ব্যতিরেকে অপরটি শ্রোতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। মুন্ডা সম্প্রদায়ের ভাষা মুন্ডারী। মুন্ডারীর বহিরঙ্গর বৈশিষ্ট্য সাঁওতালীর মতই, কিন্তু অন্তরঙ্গে অন্য কথা বলে। যেমন, 'উমা' শব্দটি। মুন্ডারীতে 'উমা' শব্দের অর্থ 'মা' অর্থাৎ মাতা। এবং 'দিরি' শব্দের অর্থ 'পাথর'। সাঁওতালীতে রাঁচী অঞ্চলে পাওয়া যায় 'পাথর'। শব্দের অর্থরূপ পাওয়া যায় 'দিরি' শব্দে। মজার কথা এটাই যে বাঙলা সম্ভবত মুন্ডারীর 'দিরি' দন্ত্য থেকে কণ্ঠ্যতে পরিবর্তিত হয়ে 'গিরি'তে পর্যবসিত হয়েছে। তারপর হয়েছেন গিরিকন্যা।

যাই হোক, যে প্রসঙ্গ অবতারনার আগ্রহ দেখিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু করেছি তার কিছু সহসা ছেদ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ একটাই প্রবন্ধকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। বর্তমান প্রবন্ধের শেষে মনে হতে পারে হঠাৎই নতুন প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে প্রকৃত অর্থেও তাই-ই। গঙ্গা পদ্মার দোয়াব অঞ্চলে বসবাসকারী অবাঙলাভাষাভাষীদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য, শিল্প বিস্তারের কারণে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় সন্ধান দুঃসাধ্য। অথচ এদের একটা গরিষ্ঠ অংশই জীবিকার প্রয়োজনে শিল্পাঞ্চলে বাস করে। তবে সরকারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে এদের টোটেম অনুসারে উপগোষ্ঠীর সন্ধান পেলে ভাল হোত। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বভাগীরথী অঞ্চল, নদীয়া এবং দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় বিস্তৃত পরিসংখ্যান ছাড়াই সীমিত কয়েকটি পকেট এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মিশ্র পরিবেশে কর্মরত হিন্দী (ভোজপুরী, মৈথিলী) এবং ওড়িয়া জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলিকে অবলম্বন করে তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক রীতিনীতি এবং পরিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। এসব জেলায় অভিবাসনের মূল সূত্র, সুতরাং এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ব্যাপকভাবে কোন এলাকার এক সুনির্দিষ্ট অবাঙলাগোষ্ঠী সমূলে এসব জেলায় চলে আসেনি। বিভিন্ন সময়ে কাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কোন্ ভূম্যাধিকারী বা ঠিকাদার বা স্বউদ্যোগে কায়িক শ্রমের জন্যই নিয়ে আসা হয়েছিল। পশ্চিমবাঙলায় জনসংখ্যার ভাষার হিসাবে বাঙলাভাষীদের পড়েই হিন্দী ভাষীদের সংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিসংখ্যাগত দিক দিয়ে অবাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দী ভাষাভাষীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাষাতাত্ত্বিক উৎস বিচারে বাংলা এবং হিন্দী একই প্রাকৃত ভাষা উদ্ভুত হলেও অসমীয়া এবং তৎপরে ওড়িয়া বাঙলার যতখানি কাছের তাদের হিন্দী ততটা নয়। অর্থাৎ একই আদি জননীর বংশধর হলেও শরিকানী সম্পর্কে একটু দূরের। বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর মতই ওড়িয়াদের নিজস্ব উপভাষা এবং তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজের প্রয়োজনে প্রায় প্রতিটি জেলাতে এদের দেখা পাওয়া যায়। কোথাও এরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকিভাবে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। আবার কোথাও পরিয়ায়ী চরিত্রের। কাজের বিশেষ মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। তার ফলে দেখা যায় এদের কথাবার্তায়, শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ও ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনুধাবনযোগ্য।

ভারতের আদিবাসী সমাজের বিশ্লেষণে আমরা উত্তর ভারতে যে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাই, তাদের মধ্যে প্রায় আটত্রিশটি উপজাতির বাস পশ্চিমবঙ্গে। এদের ভাগ বিচারে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এক - অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী, দুই - দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, তিন - তিব্বতী চীনা ভাষা গোষ্ঠী এবং চার - ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী। এসব ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তিব্বতী চীনা ভাষাগোষ্ঠীর উপজাতির সঙ্গে সমতলের সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। অন্য তিনটি ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমবাঙলায় যারা সর্বাধিক সংখ্যক বাস করে তারা সাঁওতাল। এরপরেই ওঁড়াও এবং মুন্ডা উপজাতি। জনসংখ্যার বিচারে এরাজ্যের প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সাঁওতাল ব্যতিরেকে ওঁড়াও, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, মৈথিলী মালপাহাড়িয়া, লোধা (খড়িয়া) এবং মেট্। এসব উপজাতি গোষ্ঠী। এদের প্রত্যেকটি উপজাতিরই জনসংখ্যা বর্তমানে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজারেরও বেশি।

পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা – এসব জেলায় সাঁওতালদের পরেই যে উপজাতিগোষ্ঠী বাস করে তারা ওঁড়াও। এদের শিক্ষার হার খুব কম। বাঙলা ভাষাভাষীদের মতই এদেরও নিজস্ব উপভাষা ও তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এরা শুধু রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট এলাকারই যে বাসিন্দা তা নয়। কাজের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় এদের সাক্ষাৎ মেলে। এরা কোথাও স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকি উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। আবার কোথাও পরিয়ারী চরিত্রের। কাজের বিশেষ মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা যে কারণ দেখা যায় যে এদের কথাবার্তায়, শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব খুব একটা স্পষ্ট না হলেও খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে অণুধাবন করা যেতে পারে।

পূর্ব ভাগীরথী অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়ও এসব উপজাতি গোষ্ঠীর দেখা মেলে। বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, পেশার দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর এবং সাক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দগুলিতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ সমূহ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে সাক্ষর – নিরক্ষর অচল বা সচল যে কোন শ্রেণিভুক্ত হোক না কেন, বেশি বয়েসের বাচক গোষ্ঠীরা সামাজিক রীতিনীতির মতই উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অতীতকে ধরে রাখার প্রবণতা যথেষ্ট বর্তমান। অল্প বয়স্ক যারা তারাও শ্রেণি নির্বিশেষে উচ্চারণের ক্ষেত্রে মোটামুটি মধ্যপন্থী। অর্থাৎ তারা প্রাচীন অভ্যাস কিছুটা বজায় রাখলেও রাঢ়ী প্রভাবে উচ্চারণের নতুন রূপকে মেনে নিতে তেমন অসম্মত নন। আর চল্লিশের নিম্ন বয়স্করা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নতুন যারা তারা অনেক সহজেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করে রাঢ়ী শব্দের নতুন রূপ স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে রাজী। অবাঙলাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক

বিবর্তনটি বয়ঃক্রমিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই বিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখাতে হলে বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর, সাক্ষর, অচল ও সচল দিক থেকে বিচার করলেই আমাদের সঠিক সত্যের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হবে। ভাষিক প্রবণতার পার্থক্য নিরূপণে বাচক গোষ্ঠীর কথ্য ভাষার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়। যারা প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে এলাকার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না তারাই অচল আর যারা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাদের সচল বলে উল্লেখ করা হল। মানুষের আশ্রয় বা বাস পরিবর্তন হলে সর্বাধিক প্রভাব সম্ভব দ্বারাই ভাষার প্রকাশরীতি বা উচ্চারণরীতি বিবর্তিত হয়। সে কারণে এদের কথাবার্তায় শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অণুধাবন করা যায়।

তথ্যসূত্র / গ্রন্থঋণ :

1. Chottopadhya S. & S. Sen, A middle Indo-Aryan Reader, C.U. 1960
2. Potter S., Language in Modern World. 1964
3. Risley H.H., The Tribes & Cast of W.B. Vol.- I & II, Cal – 1891
4. Bose N.K., Some Indian Tribes, Cal
5. Jespesson O., Language : Its nature, London
6. Raid J., A Grammar of the Bengali Language, 2013
7. A Grammatical Sketch of Juang, a Munda Language, data collected from Web Page
8. J. Peterson A Grammar of Kharia.

১. সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৭৯
২. ঠাকুর ধীরানন্দ, বাংলা উচ্চারণ কোষ, কলকাতা, ১৯৫৩
৩. বিশ্বাস সুকুমার,ভাষা বিতান পরিচয়, কলকাতা, ১৯৬৮
৪. চট্টোপাধ্যায় নরেন্দ্র নাথ, বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা - ১৯৬৯
৫. গোস্বামী কৃষ্ণপদ, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬৬
৬. বসু দ্বিজেন্দ্র নাথ,বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা (১ম), কলকাতা, ১৯৭৫

*****